লকডাউন পর্বে বিদ্যার্থীদের জন্যে পাঠ-সহায়ক

ড. মাল্যবান চট্টোপাধ্যায়

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ , আসানসোল গার্লস কলেজ

বিষয়

চোলদের নৌ সাম্রাজ্যের প্রকৃতি

উত্তর ভারতে গুপ্ত শাসনের অবসানের পর ভারতবর্ষের ইতিহাসের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমভাগ এবং আরও দক্ষিণে তামিল অঞ্চল। আর তামিল অঞ্চল বললে যে রাজবংশ এর কথা অবশ্য উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে তা হল চোল । উপাদানের দিকে তাকালে দেখা যেতে পারে পেরিপ্লাস অফ দি এরিথ্রিয়ান সি গ্রন্থকে। সেখানেও চোলদের কথা পাওয়া যায়।

আদি মধ্যযুগের ভারতবর্ষে একাধিক শক্তিশালী আঞ্চলিক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছিল দক্ষিণ ভারতে এমন শক্তি হিসেবে চোলদের উত্থান রাজনৈতিক গুরুত্ব ছাড়াও স্বতন্ত্র কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে। একটি হলো তাদের নৌ অভিযান অন্যটি হলো গ্রামীণ স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার রূপায়ণ। আদি মধ্যযুগের ভারতের সামুদ্রিক অভিযান একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিনব ঘটনা ছিল। চোলদের নৌ নীতি বিশিষ্টতার দাবি অবশ্যই এক্ষেত্রে রাখে। চোলদের সামুদ্রিক অভিযান এর সূচনা করেন প্রথম রাজরাজ।আনুমানিক ৯৮৫ থেকে ১১২২ অব্দের মধ্যে,চোলদের সামুদ্রিক অভিযান এর হাত ধরে বঙ্গোপসাগর কার্যত চোল নিয়ন্ত্রণ অধীন সমুদ্রে পরিণত হয়েছিল।

চোলদের সামুদ্রিক অভিযান এর সূচনা করেন প্রথম রাজরাজ(৯৮৫-১০১৮ খ্রিস্টাব্দ)। তার চতুর্থ রাজ্য বর্ষের একটি লেখ তে দেখা যায় যে চের রাজ্যে তথা কেরল রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন এবং তা বিধ্বস্ত করেছিলেন। এই সূত্রে তিনি একটি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন- কুন্দলুর-স্পালৈ-কলমরুগু।স্পালৈ একটি তামিল শব্দ যার অর্থ নোঙ্গর ফেলার স্থান।কুন্দলুর-স্পালৈ কে ঐতিহাসিকগণ বর্তমান ত্রিবান্দ্রম অঞ্চল বলে শনাক্ত করেছেন। এইভাবে সমুদ্র উপকূলে কর্তৃত্ব স্থাপন এর মধ্যে দিয়ে রাজরাজ সামুদ্রিক অভিযানের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেন। অষ্টম রাজ্য বর্ষের একটি লেখ তে দাবি করা হয়েছে যে তিনি উন্মুক্ত সমুদ্র অঞ্চলে অবস্থিত ইলম জয় করেছিলেন। তার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী প্রথম রাজেন্দ্র চোলের তিরুবলাঙ্গরু তাম্রলেখ থেকে জানা যায় যে তার পিতা ইলমন্ডলম বা শ্রীলঙ্কা জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।বৌদ্ধ গ্রন্থ দীপ বংশ ও মহাবংশ তে বলা হয়েছে যে চোলদের আক্রমণে সন্ত্রস্ত হয়ে সিংহল রাজ পঞ্চম মহেন্দ্র দক্ষিণ পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন । সিংহলের উত্তর ভাগ দখল করে প্রথম রাজরাজ এর নতুন নাম দিয়েছিলেন মুম্মুডি-চোলমন্ডল। রাজরাজ এরপর সিংহলের রাজধানী অনুরাধাপুর ধ্বংস করেন এবং চোল অধিকৃত সিংহলকে আলাদা একটি প্রদেশ হিসেবে চোল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হয়ে যায় পূর্ববর্তী তামিল রাজবংশ গুলির সঙ্গে চোলদের। তারা সিংহলকে শুধুমাত্র পরাস্ত করেই ক্ষান্ত হননি বরঞ্চ তাকে সাম্রাজ্যভুক্ত পর্যন্ত করেছিলেন। চোলদের আগের তামিল শাসকরা সিংহল কে পদানত করেছিলেন বারবার কিন্তু তাকে সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত সেভাবে করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। অর্থাৎ এর থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় রাজরাজ এর উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটানো।

রাজরাজ এর শেষ উল্লেখযোগ্য নৌ-অভিযান ছিল ভারত মহাসাগরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত মালদ্বীপ পুঞ্জের বিরুদ্ধে। ছিল। চোল সম্প্রসারণ ভারতের বাইরে ও যে প্রভাব বিস্তৃত করেছিল তা বোঝা যায় প্রথম রাজরাজ এর মালদ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন প্রান্তে অভিযান প্রেরণের বিষয়টিকে লক্ষ্য করলে। রোমিলা থাপার উল্লেখ করেছেন যে প্রথম রাজরাজ এর মালদ্বীপপুঞ্জের বিরুদ্ধে অভিযান করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম কারণ ছিল,তাদের সাথে আরব বণিকদের যোগাযোগ। চোলদের অন্যতম শত্রু কেরল রাজ্য ছিল আরবদের পৃষ্ঠপোষক আর এই আরবদের বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র ছিল মালদ্বীপপুঞ্জ। রাজরাজ এর পরবর্তীকালে প্রথম রাজেন্দ্র চোল এই অভিযান কে আরো বিস্তৃত করেছিলেন। তিনিও সিংহলের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে আগ্রহী ছিলেন এবং বৌদ্ধ গ্রন্থ মহাবংশ উল্লেখ করা হয়েছে যে সিংহলের বিভিন্ন প্রান্তে লুটতরাজ

চালিয়েছিলেন তিনি। এই লুটতরাজ থেকে বৌদ্ধ বিহারগুলিও মুক্তি পায়নি। তবে মহাবংশতে এটিও বলা হয়েছে যে চোলদের এই আধিপত্য সিংহলে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।তাঁর কর্মকাণ্ডের অন্যতম নিদর্শন মেলে তিরুমালৈ লেখতে।

প্রথম রাজেন্দ্র চোল(১০১২-১০৪৪) এর রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে একটি লেখতে দেখা যায় যে তিনি পূর্ব ভারতের উপকূল দিকে অভিযান পাঠিয়েছিলেন । বেঙ্গী রাজ্যের সাথে এই যুদ্ধে কলিঙ্গদেশ তাদের সাহায্য করার কারণে ক্ষুব্ধ চোল রাজা কলিঙ্গকেও জবাব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং সৈন্য নিয়ে গঙ্গা নদীর মোহনা পর্যন্ত হাজির হয়ে যান এবং চোলসেনা বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে উড়িষ্যা ,রায়পুর, বিলাসপুর, সম্বলপুর, বঙ্গদেশ জয় করে নিয়ে ফেরত আসে গঙ্গার জল নিয়ে এবং এর ফলে কাবেরী বদ্বীপ থেকে গঙ্গার বদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে চোলদের সামরিক সাফল্য বিস্তৃত হয় তবে কোন অঞ্চলের ওপরই চোলদের শাসন স্থাপিত হয়নি ।এছাড়াও প্রথম রাজেন্দ্র চোল অবশ্যই শ্রীবিজয় অভিযানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছিলেন এটি ছিল একটি দ্বীপরাষ্ট্র। এই অভিযানের ফলে তিনি শ্রীবিজয়(সুমাত্রার পালেমবাঙ্গ অঞ্চল) , পন্নই(সুমাত্রার পূর্ব উপকূলে অবস্থিত পানি), মলইয়ূর (সিঙ্গাপুর নিকটবর্তী উত্তরাঞ্চলের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল), মদমলিংগম(সিয়ান উপসাগরের তাম্রলিঙ্গ অঞ্চল),কাদারাম (মালয় উপদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত কেডা অঞ্চল) প্রভৃতি অঞ্চলে আভিযানের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন প্রান্তে তার আধিপত্য কে বিস্তৃত করেছিলেন তিনি।লক্ষণীয় এক্ষেত্রেও এই বিস্তৃত অঞ্চল কে কখনোই সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করেননি চোল রাজ। প্রথম রাজেন্দ্র চোল এর পরবর্তী শাসকদের মধ্যে রাজাধিরাজ(১০৪৪-৫৪)দ্বিতীয় রাজেন্দ্র(১০৫৪-৬২),অধিরাজেন্দ্র(১০৭০) এর নাম বলা যেতে পারে। এদের সময় নৌ বাহিনী অবশ্যই ব্যবহৃত হয়েছিল সিংহলের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য।

সিংহলের রাজা প্রথম বিজয়বাহু চোল শাসনের অবসান ঘটাতে সচেষ্ট হলে বীর রাজেন্দ্র ১০৬৫ খ্রিস্টাব্দে সিংহল আক্রমণ করেছিলেন এবং তাঁর একটি লেখ তে দাবি করা হয়েছিল যে তিনি বিজয় বাহুকে পরাস্ত করে সমগ্র সিংহলের ওপর অধিকার বিস্তৃত করেছিলেন পুনরায় ।চোল বংশের শেষ শক্তিশালী রাজা ছিলেন প্রথম কুলতুঙ্গ (১০৭০-১১২০)।তার দীর্ঘ ৫০ বছরের শাসনে তিনি সিংহলে কোন অভিযান পাঠাননি এবং বলা যেতে পারে সিংহল চোল নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পেয়ে গিয়েছিল সেই সময়। ১০৭০ সালের পরে সিংহলে কোন চোল লেখও পাওয়া যায়নি ।

চোল রাজারা দীর্ঘ ১৩৫ বছর ধরে একটি পরাক্রান্ত নৌবহরের সাহায্যে সমুদ্রের বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভিযান চালিয়েছিল কিন্তু একমাত্র সিংহল ছাড়া কোন এলাকায় তারা স্থায়ীভাবে সাম্রাজ্যভুক্ত করেননি। এটাই চোলদের সামুদ্রিক অভিযান গুলির মূল উদ্দেশ্য নিয়ে সংশয় সৃষ্টি করার অন্যতম কারণ। ঐতিহাসিক দের ব্যাখ্যার বিভিন্নতা সেই ভাবনাকে আরো দৃঢতর করে। রমেশচন্দ্র মজুমদার ,কে. জি. কৃষ্ণান প্রমুখের মতে রাজনৈতিক গৌরব অর্জনের লক্ষ্যে নতুন নতুন রাজ্যকে পদানত করে দিগ্বিজয়ী আখ্যা লাভের জন্যই এই সকল অভিযানগুলো চালিত হয়েছিল। তবে এর ভিন্ন মত বিদ্যমান। কারণ দিগ্বিজয়ের বাসনা কোন একজন বা দুজন শাসকের মধ্যে দানা বাঁধতে পারলেও, ধারাবাহিকভাবে ৫ থেকে ৭ জন শাসকের মধ্যে এই মনোভাব টিকে থাকা সম্ভবপর নয় । তাছাড়া এটি লক্ষণীয় যে তারা যে অঞ্চলেই জয়লাভ করেছেন সেই অঞ্চলকেই রাজ্যভুক্ত করেননি,এক্ষেত্রেও তারা নির্দিষ্ট ভাবে কিছু স্থানকে চিহ্নিত করে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ গোটা বিষয়টির মধ্যে তাদের নিজস্ব কিছু ভাবনা অবশ্যই ছিল যার দ্বারা চালিত হয় তারা বংশানুক্রমিকভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে সাম্রাজ্যবিস্তারের নীতিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ,কিন্তু সব স্থানকে তাঁরা সাম্রাজ্যভুক্ত করেননি।এখানেই উল্লেখ করা যেতে পারে

বারটান্ড স্টাইন বা জর্জ স্পেনসার এর মত ঐতিহাসিকের বক্তব্যকে ।তাদের মতে চোলদের সামুদ্রিক ক্রিয়া-কলাপ কে রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে দেখার বদলে দেখা উচিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হিসেবেই।

এদের মতে চোল শাসন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ। রাজা কেন্দ্রে ছিলেন কিন্তু রাজস্ব সংগ্রহের কাজ করতো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ- ঊর, সভা , নাত্তার ।উড়াইয়ুর সহ অন্যান্য বিভিন্ন লেখকের ভিত্তিতে এরা দেখিয়েছেন যে স্থানীয়ভাবে রাজস্ব সংগ্রহ হওয়ার ফলে অনেকটাই কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা পরতো না। কিন্তু শাসন পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিল আর তাই যারা যারা অর্থ সংগ্রহের কাজে সর্বদা লিপ্ত থাকতেন এবং সামুদ্রিক অভিযান গুলির প্রধান লক্ষ্যই ছিল অর্থ সংগ্রহ করা অর্থাৎ যুদ্ধ গুলি সংহতি মূলক কার্যধারা বা ইনটিগ্রেটিং অ্যাক্টিভিটি ছিলনা।

তারা এর সঙ্গে চোল সেনাবাহিনীর প্রকৃতি কেও উল্লেখ করেছেন ।এরা মনে করেন চোলদের কোনো স্থায়ী সুসংগঠিত বাহিনী ছিল না। মূল ছোট বাহিনীর সাথে যুদ্ধকালে ভাড়াটে সৈনিক নিয়োগ করা হতো এই পাঁচ মিশালি বাহিনীকে সর্বদা কর্মরত না রাখলে তাদের কর্মদক্ষতা ও আনুগত্যের

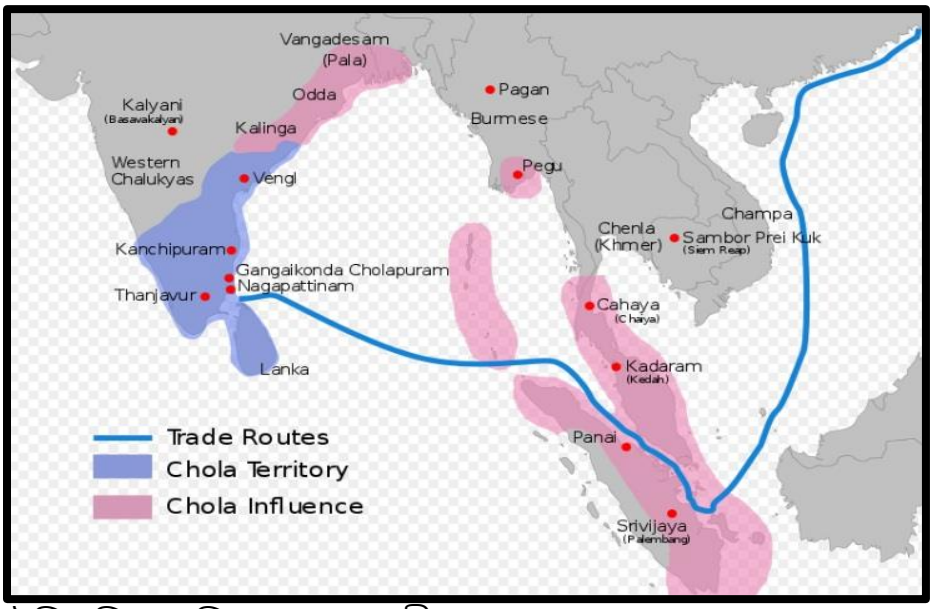

ঘাটতি দেখা দিতে পারে তাই চোলরাজারা নিরন্তর যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন।

বিশ শতকের আশির দশক থেকেই স্টাইন ও স্পেন্সারের বক্তব্যের প্রবল বিরোধিতা শুরু হয়েছিল। ডি এন ঝা , আর চম্পকলক্ষী, ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ঐতিহাসিক,দেখিয়েছেন যে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা থাকলেও গ্রাম স্তর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের প্রশাসনিক প্রভাব কার্যকরী ছিল। তাঁরা শাসকদের লেখ গুলির নতুন ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করেছেন যে তথাকথিত স্বাধীন গ্রামসভা গুলি কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে ছিল তাই রাজস্ব ঘাটতি মেটানোর জন্য গ্রহণ করতে হয়েছিল এই ব্যাখ্যা মানা যায় না। রণবীর চক্রবর্তী তার ওয়ারফেয়ার ফর ওয়েলথ : আর্লি ইন্ডিয়ান পারস্পেক্টিভ শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন যে দশম শতক থেকেই চোলরা নিয়মিত ভাবে খমের , বর্মা,, উত্তর ভিয়েতনাম , চীন ও আরবদের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে খোঁজ রাখছিল এবং তাদের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। তাদের সাথে শ্রীবিজয়ের সুসম্পর্ক ছিল।শ্রীবজয়ের রাজা সংগ্রাম বিজয়তুঙ্গবর্মন চোল রাজ্যের নাগাপট্টমে চূড়ামনবিহার ও তৈরি করেছিলেন। এই সুসম্পর্ক এর সাথে জুড়ে ছিল আর্থিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ। আসলে চীন ও করমন্ডল উপকূল এর বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শ্রী বিজয় অন্তর্বর্তীর ভূমিকা পালন করছিল।সেই অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যই শ্রী বিজয়ের শাসকরা চোলদের সঙ্গে এক সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলো দীর্ঘদিন। কিন্তু চোল

রাজারা এই অন্তর্বর্তীর অস্তিত্বকে মুছে দিতে তৎপর হয়েছিলেন এবং অন্তর্বর্তী কে এড়িয়ে চীনের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

এই জন্যেই তাঁরা বারবার কডারম বা শ্রীবিজয় আক্রমণ করেছিলেন।লক্ষণীয় তাদের জয় করা প্রতিটি অঞ্চলে ছিল বাণিজ্যিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এক্ষেত্রে নীলকান্ত শাস্ত্রী মন্তব্য করেছেন যে রাজেন্দ্র পূর্ব ভারত অভিযান চালিত হয়েছিলভারতের পূর্ব উপকূল বরাবর। কারণ ওই উপকূলের সমৃদ্ধ বন্দর এবং বাণিজ্য ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করাই চোল শাসকদের লক্ষ্য ছিল। তাই এটা অবশ্যই বলা দরকার চোলদের সামুদ্রিক অভিযান গুলি শুধুমাত্র বিশুদ্ধ লুন্ঠনের প্রবৃত্তির প্রকাশ ছিল না,এর সাথে জুড়ে ছিল সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার বিষয়টিও।

SUGGESTED BOOKS & ARTICLES

Chakravarti, R. 2011. “The Pull of the Coast.” Presidential
Address, Indian History Congress,
Patiala.

Champakalakshmi, R. 1996. Trade Ideology and
Urbanization in South India 300 BC to AD 1300.
Delhi: Oxford University Press.
Kulke, H., (ed.), The State in India 1000-1700, New Delhi, 1995.

Sastri K.A.Nilakanta,A History of South India: From Prehistoric Times to the Fall of Vijayanagar , Oxford,1997